সুন্দরবনে তেল বিপর্যয় : একটি প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ নমুনা

পাভেল পার্থ

১২ থেকে ১৫ ডিসেম্বর তেল-আক্রান্ত সুন্দরবন পূর্ব বন বিভাগের চাঁদপাই রেঞ্জে এক প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ অভিজ্ঞতা থেকে চলতি আলাপটি দাঁড় করানো হয়েছে। বিবরণ ব্যাখ্যায় জেলে, বাওয়ালি, মৌয়াল, মাঝি গুনিনসহ বাদাবনের প্রথাগত বনজীবীদের লোকায়ত বনবিজ্ঞানের পাশাপাশি এখানে যুক্ত হয়েছে বিদ্যায়তনিক বিশ্লেষণ ও নাগরিক মতামত। সুন্দরবনে কর্ম অভিজ্ঞতা যাঁদের বছর পনেরো পাড়ি দিয়েছে, বন বিভাগের এমন সব গুরুত্ববহ পর্যবেক্ষণও এই আলাপে শামিল হয়েছে। তেল বিপর্যয়ের পর কী অবস্থা বিরাজ করছে, এর প্রতিক্রিয়া ও প্রভাব এবং কিছু করণীয় নিয়ে এই আলাপের বিস্তার মুমূর্ষু অরণ্যপ্রবাহের প্রতি প্রশ্নহীন রাষ্ট্রীয় অবহেলাকে প্রশ্ন করছে।

আঠালো চিটচিটে পিচ্ছিল কালচে তেলের বিপজ্জনক আস্তর নিয়েও সুন্দরবন পাড়ি দিয়েছে ১৪টি জোয়ার-ভাটা। বাংলাদেশ অংশের পূর্ব সুন্দরবন বন বিভাগের মৃগমারী এলাকায় ৯ ডিসেম্বর ২০১৪ তারিখে 'এমটি সাউদার্ন স্টার-৭' নামের এক কার্গো বোট ডুবে তিন লাখ ৫৭ হাজার ৬৬৪ লিটার ফার্নেস তেল ছড়িয়ে পড়ে শ্যালা নদীসহ চাঁদপাই রেঞ্জের প্রায় ২০টি খাল, দুটি ভাড়ানী, শীষে খাল, ঝোরা ও বনস্তরে।

সরেজমিন তেল বিপর্যস্ত বাদাবন

একক আয়তনে দুনিয়ার বৃহত্তম এই শ্বাসমূলীয় অরণ্য স্থানীয়ভাবে বাদাবন হিসেবে পরিচিত। সুন্দরবন পূর্ব ও পশ্চিম দুটি বিভাগে বিভক্ত পূর্ব সুন্দরবন শরণখোলা ও চাঁদপাই রেঞ্জ নিয়ে বিস্তৃত। চাঁদপাই রেঞ্জের চারটি স্টেশনের মধ্যে ধানসাগর ও চাঁদপাই অঞ্চল দিয়েই বয়ে গেছে শ্যালা নদী। বছরে একবার এই নদী তার মিষ্টি ও লবণ স্বাদ পাল্টায়। চাঁদপাই স্টেশনের নন্দবালা টহল ফাঁড়ির কাছ থেকে জন্ম নিয়ে নদীটি প্রায় ৮০ কিলোমিটার প্রবাহিত হয়ে চারধারের বাদাবনকে আগলে নিয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। জোয়ারের উজানে এই নদীর মিতালি পশুরের সাথে, ভাটির দিকে পাথরিয়া, দুধমুখী ও বলেশ্বর। এ নদীর সম্পূর্ণ ধারাপ্রবাহেই ভাসমান তেলের আস্তরণ দেখা গেছে। কোথাও কালচে, কোথাও হালকা বাদামি ও কালচে সোনালি আভার স্তর দুধের সরের মতো ভাসছে। জোয়ার ও ভাটার সময় এই বিস্তাররেখা ও আস্তরণ বদলে যাচ্ছে। নদীজুড়ে কালো তেল মাখানো কচুরিপানা, ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের বীজ ও গ্রাম থেকে ভেসে আসা কলাগাছ।

> সকল প্রাণীই ধীরে ধীরে এক গভীরতর খাদ্যসংকটে পড়তে পারে। অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর নিজ প্রজাতি ও অন্য প্রজাতির ভেতর তৈরি করতে পারে টিকে থাকার সংঘর্ষ। এতে অনেক প্রাণী হারাবে সুন্দরবন। কারণ নতুন প্রতিবেশে সকল প্রাণীই টিকে থাকার জন্য যথেষ্ট পরিসর ও খাদ্য পাবে না। সুন্দরবনের ওপর নির্ভরশীল স্থানীয় জনগণের পেশা ও আয়-রোজগারও এর ভেতর দিয়ে বদলে যাবে। জীবিকার দায়ে তাদেরও ঘটবে এক উল্লেখযোগ্য স্থানান্তর। এই বিপর্যয় ধীরে ধীরে সুন্দরবনের জীবনপ্রবাহকে এক অন্য দিকে দুমড়েমুচড়ে দেবে।

মৃগমারী, ভাইজোড়া, আন্ধারমানিক, লেমুয়া, ভেড়ী, তাম্বুলবুনিয়া, কলামুনী, কাচিটানা, হরিণটানা, হরমল, বড় কেওড়াবুনিয়া, ছোট কেওড়াবুনিয়া, চইট্টার, বাদামতলী, পাটাকাটা-খাজুরা, গাববাড়িয়া খালসহ বনের ছোট নালা-খাঁড়িগুলোতেও তেলের বিস্তার দেখা গেছে। ভাটার সময় খাল থেকে বনের দিকে ৫০ ফুট ভেতরে বনতলেও তেলের বিস্তার দেখা গেছে। চর থেকে শুরু করে বনের কাদামাটি পর্যন্ত সবই তেলে কালো রং ধারণ করেছে। নদী ও খালপাড়ের চরে বেড়ে ওঠা উড়ি ঘাস, চারাগাছ, হরগোজা, চরগাদা শাক, শণঘাস, টাইগার ফার্ন ও কাদায় আটকে থাকা নানা প্রজাতির বীজ তেলের ঘন আস্তর নিয়ে কালো হয়ে গেছে। জলপ্রবাহের কাছাকাছি অধিকাংশ গাছের শ্বাসমূল, ঠেসমূলে তেলের আস্তরণ পড়েছে। গোল, কেওড়া, বাইন, গেওয়া, গরান, পশুর, ছইলা, সুন্দরী, হেন্তালসহ প্রায় সব গাছের শিকড়ই তেল-আক্রান্ত হয়েছে।

জোয়ারের স্রোতে জলপ্রবাহের কাছাকাছি অনেক গাছের কাণ্ড, ডালপালা ও পাতার সারিতেও তেলের আস্তর লেগেছে। ঘটনার পর থেকে প্রতিদিন দুটি জোয়ার ও ভাটা হিসেবে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৪টি জোয়ার-ভাটায় এই তেলের বহুমুখী বিস্তার ঘটেছে জল থেকে স্থল সর্বত্র। ভাটার সময় বনের বাইরের দিকে তেলের কয়েক প্রস্থ দাগ দেখা যাচ্ছে। নদীর পাড় থেকে ওপরের দিকে পুরো বনে দুই থেকে সাড়ে তিন ফুট উচ্চতায় তেলের আস্তর পড়েছে। কালিলতা, পাখিবাসা ফার্ন, পরাশ্রয়ী লতাগুল্ম, মস, শৈবাল, লাইকেন পর্যন্ত তেলে মাখামাখি হয়েছে। জোয়ারের উচ্চতার কাছাকাছি থাকা অনেক বড় গাছের ঢোঁড় (খোঁড়ল) অবধি তেল ঢুকেছে। এসব ঢোঁড় ভোঁদড়, গুইসাপ, সাপ, পাখি, মৌমাছিসহ অনেক জীবের আবাসস্থল। এ ক্ষেত্রে বাইন ও পশুরগাছের ঢোঁড়ই বেশি আক্রান্ত। বনতলে বাইন, পশুর, গোল, সুন্দরী ও কেওড়ার চারাগাছ ও কিছু নতুন অঙ্কুরোদ্গম দেখা গেছে। সব কিছুতেই তেল জড়িয়েছে। জোয়ারের জলে ভেসে আসা বীজগুলোতে তেলের গভীর আঠালো প্রলেপ পড়েছে। এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সুন্দরী ও গোলগাছের বীজ।

১৩ থেকে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত শ্যালা নদী ও খাল দিয়ে প্রায় ৬০ কিলোমিটার ঘুরে ২টি ঈগল, ৪টি মাছরাঙা, ৫টি বানর, ৩টি কুমির, ১টি গুইসাপ, ২টি শূকরছানা, ২টি বড় শূকর, ২টি হরিণ, কাদায় আটকে থাকা ২টি মেন মাছ, ১টি ছোট কালো কাঁকড়া, ১টি কেওটে সাপ দেখা গেছে। মৃগমারী এলাকায় কোনো ডলফিন দেখা যায়নি, হরিণটানা ভাড়ানীতে ১৪ ডিসেম্বর বিকালে ৪টি শুর (ডলফিন) দেখা গেছে। এ সময়টাতে ছইলাগাছে পূর্ণবয়স্ক সবুজ ফল ও কাদায়

আটকানো তেলমাখানো কালো ছইলা ফল দেখা গেছে। নদীর চর, খালের পাড়– কোথাও বাঘ ও হরিণের পায়ের ছাপ দেখা যায়নি। আলকিরচর এলাকায় বনের ভেতর থেকে ভেসে আসা পাখির ডাক শোনা গেছে, মাত্র ৫ প্রজাতির একটি-দুটি করে পাখির চলাচল দৃশ্যমান হয়েছে। তেল বিপর্যয়ের পর থেকে ঘটনার কাছাকাছি জয়মনি বাজারে সুন্দরবনের নদীর কোনো মাছ বিক্রি হতে দেখা যায়নি। শ্যালা নদী ও খালে খুব কম জেলে ও কাঁকড়াশিকারি দেখা গেছে। তাদের কাছে খুবই কম পরিমাণ ফাইসা, ভোলা, গলদা চিংড়ি ও কয়েকটি মাত্র কাঁকড়া দেখা গেছে। চাঁদপাই ও ধানসাগর স্টেশনজুড়ে পুরো সুন্দরবনে এক অবর্ণনীয় নিস্তেজ অবস্থা, তেলের অসহনীয় বিস্তার, বন বিভাগের লাগাতার গাফিলতি এবং বনজীবীসহ স্থানীয় জনপদে বনজীবনের আশঙ্কা ও ক্ষোভ বিরাজ করছে।

শ্বাসরুদ্ধ শিকড় ও তেলবন্দি ভ্রূণ

শ্বাসমূলগুলোতে তেলের আস্তর পড়ায় এগুলোর শ্বাসরন্ধ্র বন্ধ হয়ে গেছে। বন্ধ হয়েছে পত্ররন্ধ্র। এসবের মাধ্যমেই পুরো সুন্দরবনের গাছপালা শ্বাস নেয়, অক্সিজেন ছড়িয়ে দেয়। তেলের আবরণের ফলে গাছের গ্যাস-বিনিময়ে বিঘ্ন ঘটবে। ফার্নেস তেলের হাইড্রোকার্বন চারাগাছ ও মূলের কোষপর্দা ভেঙে দেবে। চারাগাছ মরে যাবে, বড় গাছের পাতা হলুদ হয়ে ঝরে পড়বে। যদি তেলের আস্তরণ দীর্ঘদিন থেকে যায়, একসময় বড় গাছগুলোও নিহত হবে। গাছের শ্বসন ও প্রস্বেদন হার বদলে যাবে। জোয়ার-ভাটার বনভূমি হলেও এখানকার বৃক্ষরাজিকে লবণজল থেকে লবণ সরিয়ে তা গ্রহণ করতে হয়। এর জন্য এখানকার অধিকাংশ গাছ ও পাতা-কাণ্ডে তৈরি হয়েছে বিশেষ শারীরিক কসরত। তেলের আবরণ সেই বৈশিষ্ট্যসমূহকে আটকে দিয়েছে।

> তেলের বাহাদুরি সামলে সুন্দরী, কেওড়া, পশুর, বাইন ও হেন্তালগাছের টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। গোল, গরান, গেওয়া, জানাগাছের ক্ষেত্রে এই তেল বিপর্যয় সামাল দেওয়ার ক্ষমতা কিছুটা বেশি। এ অবস্থা দীর্ঘমেয়াদি হলে সুন্দরবনের উদ্ভিদবৈচিত্র্য কমবে এবং উদ্ভিদের বহুমাত্রিক বিন্যাসে আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

সুন্দরবনে পানিবাহিত বীজ আর জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গমের মাধ্যমে ম্যানগ্রোভ প্রজাতির বংশবিস্তার ঘটে। চরে অবস্থানরত অধিকাংশ বীজে তেলের গাঢ় আবরণ পড়েছে। এতে এসব বীজের অঙ্কুরোগ্দম কোনোভাবেই আর হওয়া সম্ভব নয়। তেলের আবরণ বীজভ্রূণের এক করুণ মৃত্যু ঘটাবে। বেশ কিছু অঞ্চল থেকে তেল লাগানো সুন্দরীর বীজ খুলে দেখা গেছে, বীজের ভেতরকার শ্বাস ও বীজপত্র শুকিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। এমনকি জরায়ুজ অঙ্কুরোদ্গমের মাধ্যমে গাছ থেকে ঝরে পড়া অঙ্কুরোদ্গমিত চারাও তেলে দূষিত মাটিতে বেঁচে থাকার পরিবেশ হারাবে। বস্তুত সুন্দরবনের উদ্ভিদকুলের বংশ ও বিস্তার এক দীর্ঘমেয়াদি সংকটের মুখোমুখি।

বিপর্যস্ত খাদ্যশৃঙ্খল, ওলটপালট খাদ্যজাল

সুন্দরবনের প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদক, খাদ্য, খাদক ও পচন সৃষ্টিকারী অণুজীব নিজেদের ভেতর খাদ্য বিনিময়ের মাধ্যমে তৈরি করেছে নানা খাদ্যশৃঙ্খল। পানি ও মাটির অণুজীব সূর্যের আলো দিয়ে তৈরি করে সুন্দরবনের প্রাথমিক খাবার। এই খাদ্য উৎপাদকেরা ছোট মাছ, পতঙ্গ ও ছোট জীবের খাদ্য। সাপ ও বড় মাছের খাদ্য হলো পতঙ্গ ও ছোট মাছ। বড় মাছ আবার ভোঁদড়, ডলফিন ও কুমিরের খাদ্য। ভোঁদড়, গুইসাপ– এরা বাঘের খাদ্য। বাঘের মতো বড় প্রাণী মারা গেলে অণুজীবেরা একে পরিবর্তন করে আবার প্রকৃতিতে মিশিয়ে দেয়, সেখান থেকেও প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদকেরা বেঁচে থাকার রসদ পায়। অন্যদিকে মাটির নানা অণুজীব ঘাস-গুল্মের আহার জোগায়, এরা খাদ্যও তৈরি করে। ঘাস-তৃণলতা-গাছের পাতা খেয়ে বাঁচে হরিণ ও বানর। এরা আবার বাঘের খাবার। মৌমাছির মতো পতঙ্গ কেওড়াসহ নানা গাছের পরাগায়ণ ঘটায়, উদ্ভিদের বংশবিস্তার হয়। কেওড়া খেয়ে বাঁচে বানর, হরিণ ও পাঙ্গাশ মাছ। মধু সংগ্রহ করে ও পাঙ্গাশ ধরে জীবন বাঁচায় সুন্দরবনের বনজীবীরা। এভাবেই নানা খাদ্যশৃঙ্খল এই বনে তৈরি করেছে এক ঐতিহাসিক জটিল খাদ্যজাল। তেলের অসহনীয় বিস্তার এই খাদ্যশৃঙ্খলা ভেঙেচুরে দুমড়েমুচড়ে দিতে পারে। তেলের আবরণ পানিতে সূর্যের আলো প্রবেশে ও মাটিতে অণুজীবের খাদ্য পচন প্রক্রিয়াকে রুদ্ধ করবে। এই জটিল খাদ্যজালের একটি প্রাণ আঘাত পেলে তা সবখানেই সে প্রভাব ছড়িয়ে দেবে।

প্রাণনাশ ও অনিবার্য স্থানান্তর

তেল বিপর্যয়ের ঘটনায় ব্যাপক প্রাণনাশ ঘটেছে সুন্দরবনে। নির্মম মৃত্যু ঘটেছে কার্গো বোটের চালক মো. মোকছেদ মাতুব্বরের। প্রবীণ জেলেদের ভাষ্য, ফাইসা ও খরুল (বাটা) মাছ মরেছে বেশি। নদীতীরের কাদামাটিতে থাকা মেন মাছ ও কাঁকড়ার কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। পোনাসহ ছোট মাছদের মরণ হয়েছে বেশি। বীজভ্রূণ ও চারাগাছ মৃত্যুযন্ত্রণা পাড়ি দিচ্ছে। টিকে থাকার কঠিন লড়াইয়ে শামিল কাঁকড়া, সাপ, ভোঁদড়, পাখি, কুঁচে, জোংড়া ও ডলফিন। মাটিতে তেলের আস্তর পড়ায় কাঁকড়াদের ছোট গর্তগুলো ঢেকে গেছে। নতুন গর্ত না পেলে অনেক কাঁকড়াকে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মরতে হবে। ভোঁদড়, মাছরাঙা, বকসহ প্রাণী ও পাখি, যারা নদী-খাল থেকে খাদ্য সংগ্রহ করে, তারা তেল-আক্রান্ত হয়েছে। প্রবীণ বনজীবীরা মনে করছেন, তাঁরা আবাসস্থল ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিয়েছে বা নিস্তেজ হয়ে বনের ভেতরে কোনো গর্তে মরে পড়ে আছে। তেলের কারণে হাঁস, ছাগল, পাখি ও ভোঁদড় মারা গেছে। তেল লেগে এদের পালক ও পশম ঝরে যায়, ফলে শরীর তাপ হারিয়ে তারা মারা যায়।

বন বিভাগ ও স্থানীয় বনজীবীদের ভাষ্য, হরিণটানা ভাড়ানীতে তেল বিপর্যয়ের পর থেকে ২০-২৫টি ডলফিন দেখা যাচ্ছে। আগে ৪-৫টি ছিল। ডলফিনের একটি অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর ঘটেছে। নদী ও খালপাড়ে ভরা জোয়ারের সময় হরিণ, শূকর ও বানরকে পানি খেতে দেওয়া যেত। বানর ও হরিণ ভেসে যাওয়া কচুরিপানা তুলে কন্দ খেত। ঘাস, তৃণগুল্ম, কচুরিপানাসহ হরিণের খাবারের এক বড় অংশে তেলদূষণ ঘটেছে। সকল প্রাণীই ধীরে ধীরে এক গভীরতর খাদ্যসংকটে পড়তে পারে। অভ্যন্তরীণ স্থানান্তর নিজ প্রজাতি ও অন্য প্রজাতির ভেতর তৈরি করতে পারে টিকে থাকার সংঘর্ষ। এতে অনেক প্রাণী হারাবে সুন্দরবন। কারণ নতুন প্রতিবেশে সকল প্রাণীই টিকে থাকার জন্য যথেষ্ট পরিসর ও খাদ্য পাবে না। সুন্দরবনের ওপর নির্ভরশীল স্থানীয় জনগণের পেশা ও আয়-রোজগারও এর ভেতর দিয়ে বদলে যাবে। জীবিকার দায়ে তাদেরও ঘটবে এক উল্লেখযোগ্য স্থানান্তর। এই বিপর্যয় ধীরে ধীরে সুন্দরবনের জীবনপ্রবাহকে এক অন্য দিকে দুমড়েমুচড়ে দেবে।

ম্যানগ্রোভ বনে কালো তেলের আস্তরণ সূর্যের আলো বেশি শোষণ

করে নেয় এবং এ ঘটনায় উদ্ভিদ ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী উভয়ের তাপশক্তি গ্রহণে তারতম্য তৈরি হয় (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন, ২০০২)। এমন নয় যে এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া শুধু বাংলাদেশের ম্যানগ্রোভ বনেই পড়বে। দুনিয়ার অনেক জায়গাতেই ম্যানগ্রোভ বনে তেলদূষণ ঘটেছে এবং সেখানকার বৈচিত্র্য ও প্রতিবেশব্যবস্থায় তা দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব তৈরি করেছে। ১৯৭৭ সালে পুয়ের্তো রিকোতে ৩ মিলিয়ন লিটার তেল ছড়িয়ে পড়ার ৩ বছর এর প্রভাব দেখা গিয়েছিল, সেখানকার ম্যানগ্রোভ বনের গাছপালা পাতা ঝরিয়ে মরতে শুরু করেছিল। একই ঘটনা পানামা, কলম্বিয়া, ইকুয়েডরে তেল বিপর্যয়ের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে। ১৯৭৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বোটানি উপকূলে নোঙর করার সময় ১০০ টন তেল ছড়িয়ে পড়ার দুই বছর পর সেখানকার ম্যানগ্রোভ বনের বাইন ও খলসিগাছ মরে গিয়েছিল। ১৯৭৫ সালের ১৮ জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা উপকূলে জাহাজ ডুবে ২ লাখ লিটার তেল ছড়িয়ে পড়ে। এ ঘটনায় সেখানকার খামুগাছের সকল চারাগাছ মারা যায়, বাইনগাছের শ্বাসমূল তেল জড়িয়ে যাওয়ায় তারাও মারা যায়।

বৈচিত্র্য হ্রাস ও বিন্যাসে পরিবর্তন

প্রাণের জন্ম রুদ্ধ হলে ও সকল প্রাণের জটিল সম্পর্ক তছনছ হলে বৈচিত্র্যের হ্রাস অনিবার্য। সুন্দরবনের উদ্ভিদরাজি বনবিন্যাসের যে বিজ্ঞান মেনে চলে তা বদলে যেতে পারে। নদীর কূল থেকে উড়ি ঘাস, তারপর হারগোজা, গোল, হেন্তাল, টাইগার ফার্ন, কেওড়া, পশুর, বাইন ও সুন্দরী–উদ্ভিদের এমন স্তরায়ণ প্রক্রিয়া ব্যাহত হবে। উদ্ভিদরাজির এই পরিবর্তন ম্যানগ্রোভ বাস্তুসংস্থানে একটি পরিবর্তন ঘটাতে পারে। পাশপাশি মাছ কমলে ডলফিনও কমে যাবে। চাঁদপাই রেঞ্জে মূর্তির খাল, টেংরার খাল, শুয়োরমারা খাল, আন্ধাইরা খাল, বড়ইতলা খাল, কাঁটাখালীর খাল ও বৈদ্যমারীর খাল মূলত ভোঁদড় অঞ্চল। মাছ কমার পাশাপাশি কমবে ভোঁদড়ও; এবং ভোঁদড় কমলে তা বাঘ, এমনকি কুমিরের ওপরও প্রভাব ফেলবে। প্রাণিকুলের বিন্যাসও এভাবে বদলে যেতে পারে।

কাদামাটিতে মেন মাছ ও কাঁকড়া দেখা যাচ্ছে না। এদের ওপর নির্ভরশীল সাপ ও গুইসাপও এ ঘটনায় আত্মগোপন করেছে। বন থেকে উড়ে আসা বারি পোকা মাছ ও গুইসাপের মতো প্রাণীদের খাদ্য। তেল বিপর্যয়ের পর তেলের ঝাঁজে মশা, মাছি ও বন থেকে উড়ে আসা বারি পোকা বনের আশপাশের গ্রামগুলোতে কিছুটা কম দেখা যাচ্ছে। এসব পতঙ্গ, পতঙ্গের ডিম ও লার্ভা খুদে প্রাণী ও মাছের খাদ্য। তেল বিপর্যস্ত অঞ্চলটি সুন্দরবনের সুন্দরী বৃক্ষের এক মাতৃবংশ রক্ষাকারী স্থল।

তেলের বাহাদুরি সামলে সুন্দরী, কেওড়া, পশুর, বাইন ও হেন্তালগাছের টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়বে। গোল, গরান, গেওয়া, জানাগাছের ক্ষেত্রে এই তেল বিপর্যয় সামাল দেওয়ার ক্ষমতা কিছুটা বেশি। এ অবস্থা দীর্ঘমেয়াদি হলে সুন্দরবনের উদ্ভিদবৈচিত্র্য কমবে এবং উদ্ভিদের বহুমাত্রিক বিন্যাসে আমূল পরিবর্তন ঘটবে।

তেল বিপর্যস্ত এলাকার সুন্দরবনের ধারে বৈদ্যমারীর কাছে সোনামুখী বাঁওড়ে সুন্দরবনের অনেক মাছ ও জলজ জীবকুলের চলাচল ঘটে। এমনকি পানিরহাট ও নাংলীর জলাভূমিগুলোও এ বনের পানিস্রোত বিজ্ঞানের সাথে জড়িত। ভরা জোয়ারের সময় পানির প্রবাহ এসব গ্রাম-জনপদের বাঁওড়, খাল ও নালায় বিস্তৃত হবে এবং আটকে যাবে। বন থেকে এই তেলের প্রতিক্রিয়া গ্রাম-জনপদেও ছড়িয়ে পড়বে।

সুন্দরবনে তেলদূষণ ও জলযানডুবি

সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশের পূর্ব সুন্দরবন বিভাগেই মূলত ভারী জলযানের চলাচল বেশি। তাই এ পথেই জলযানডুবি ও তেলদূষণের ঘটনা বেশি। সাম্প্রতিক ঘটনার আগে এ রকম বহুবার হলেও কেউ কোনো পাত্তা দেয়নি। মংলা বন্দরের কাছাকাছি ১৯৮৮ সালের ১ জুলাই তেল কার্গো ফুটো হয়ে সুন্দরবনে ডিজেল ছড়িয়ে পড়ে এবং একই বছরের ১০ আগস্ট সুন্দরবনের মাজহার পয়েন্টে ট্যাংক সংঘর্ষে উচ্চমাত্রার সালফারযুক্ত তেল ছড়িয়ে যায় সুন্দরবনে। ১৯৯৪ সালের আগস্টে মংলা বন্দরগামী একটি বিদেশি জাহাজ সুন্দরবনের পাশে বানীসান্তায় ডুবে যায় এবং ভাটিতে ২০ কিলোমিটার এলাকায় তেল ছড়িয়ে পড়ে (পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদন, ২০০২)। সুন্দরবনের প্রবীণ জেলেদের সাথে আলাপকালে জানা যায়, সে সময় প্রতিটি ঘটনার পরপরই আশপাশের নদীতে মাছের পোনা ও ছোট কাঁকড়া মরে যায় এবং নদী ও খালপাড়ে চারাগাছ কিছুটা কম জন্মে। ২০১৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর ৬০০ মেট্রিক টন সিমেন্টের কাঁচামাল নিয়ে এমভি নয়নশ্রী-৩ পশুর চ্যানেলে ডুবে যায়। একই বছরের ১২ সেপ্টেম্বর পশুর চ্যানেলে প্রায় ৬৩০ মেট্রিক টন সিমেন্টের কাঁচামাল নিয়ে এমভি হাজেরা-২ ডুবে যায়। একই বছরের ২৪ নভেম্বর যাত্রীবাহী তিনতলা লঞ্চ এমভি শাহীদুৎ সুন্দরবনের হরিণটানা এলাকায় ডুবে যায়। উক্ত ঘটনায় বন বিভাগ ৫০ কোটি টাকার একটি ক্ষতিপূরণ মামলা করে (মামলা নং-২ হরিণ/২০১৪-২০১৫/১৪৯/চাপা)। বন বিভাগের ভাষ্য, ওই লঞ্চডুবির ফলে বনের অনেক জায়গা দুমড়েমুচড়ে গেছে, নাব্যতা সংকট তৈরি হয়েছে এবং অনেক পোনামাছ মরেছে।

> বন বিভাগের কাছেই সুন্দরবনে তেলদূষণের ক্ষেত্রে কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে এবং এ নিয়ে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি, এ বিষয়ে গবেষণা ছিল। কিন্তু ছয়টি জোয়ার-ভাটা চক্র শেষ হলেও বন বিভাগ কিছুই করেনি। সারা বনে তেলের ভয়াবহ বিস্তার ও আস্তরণ পড়েছে। ১২ ডিসেম্বর তারা ঘোষণা দিয়েছে তেল সংগ্রহের জন্য। গ্রামের শিশু-প্রবীণসহ নারী-পুরুষ সকলেই তেল অপসারণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নিজের গামছা-জামা-শাড়ি-গামলা-হাঁড়ি-পাতিল-বালতি, যার যা আছে তা নিয়েই। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সুন্দরবনে ছড়িয়ে পড়া তেল অপসারণে নেমেছে বনজীবী নিম্নবর্গ। কিন্তু রাষ্ট্র তাদের ন্যূনতম স্বাস্থ্যগত সুরক্ষা নিশ্চিত করেনি।

সংরক্ষিত বনে নৌপথ!

সুন্দরবনকে অনেকে ইউনেস্কো ঘোষিত ৫২২ নং বিশ্বঐতিহ্য এবং ৫৬০তম রামসার অঞ্চল হিসেবে বর্ণনা করতে পছন্দ করেন। পাশাপাশি এই বন বিশ্বের একক বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্য, ইরাবতী ডলফিনের সর্ববৃহৎ বিচরণস্থল। ১৯৯৯ সালে সুন্দরবনের চারপাশের ১০ কিলোমিটার এলাকাকে প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, সুন্দরবন বাংলাদেশের সংরক্ষিত বনভূমি। বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ (সংশোধন) আইন ২০১০-এর ৩নং বিধি অনুযায়ী, প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন এলাকার জলাভূমির বৈশিষ্ট্য পরিবর্তন বা নষ্ট করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। পাশাপাশি

বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন ২০১২ অনুযায়ী, সংরক্ষিত বনে নৌপথসহ সকল ধরনের কর্মকাণ্ডই আইনত নিষিদ্ধ। বিস্ময়করভাবে ২০১১ সালে সুন্দরবনে ঘোষিত হয়েছে তিনটি ডলফিন অভয়াশ্রম। অথচ এসব সংরক্ষিত অঞ্চলে কি আইন কি ধারা সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে চলছে ভারী জলযান, ঘটছে বিপর্যয়। প্রতিটি ঘটনার পর রাষ্ট্র একে বলে দিচ্ছে 'দুর্ঘটনা'। ভারত-বাংলাদেশ নৌ প্রটোকল রুট ও দক্ষিণাঞ্চলের সাথে দেশের নৌ বাণিজ্য যোগাযোগপথ হিসেবে ব্যবহৃত ঘষিয়াখালী চ্যানেল মংলা নালা ও রামপালের কুমার নদ ভরাট হয়ে প্রায় তিন বছর ধরে বন্ধ রয়েছে। তখন থেকেই সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে শ্যালা নদীকে নৌপথ হিসেবে ব্যবহার করছে অভ্যন্তরীণ নৌ কর্তৃপক্ষ। ২০১১ সালের ২৪ নভেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে নৌরুট বন্ধ করার নির্দেশ দেন। ২০১২ সালের ২১ আগস্ট পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়কে চিঠি দিয়ে নৌরুটটি বন্ধের আহ্বান জানায়। কিন্তু কেউ কারো কথা রাখেনি। বনের ভেতর দিয়ে লাগাতার চলছে জলযান, পরিবহন করছে তেলসহ বনের জন্য বিপজ্জনক পণ্য। হঠাৎ ডুবছে আর ছড়িয়ে দিচ্ছে দুঃসহ দূষণ। সাম্প্রতিক তেলদূষণের জন্য দায়ী এমটি সাউদার্ন স্টার-৭ নামের এক কার্গো বোট ২০১০ সাল থেকে সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের লাইসেন্স ছাড়াই কেবলমাত্র পেট্রোবাংলার অনুমোদন নিয়ে এই পথে চলাচল করছিল। তেল পরিবহনের আগে এটি একটি বালু বহনকারী কার্গো ছিল।

> কেবল সুন্দরবন নয়, দেশের সকল প্রাকৃতিক বনভূমিই একতরফা কর্পোরেট বাণিজ্যিক মনস্তত্ত্বের নিশানা। গ্যাস বাণিজ্যের কারণে লাউয়াছড়ার মতো বর্ষারণ্যকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয়েছে। বহুজাতিক অক্সিডেন্টাল, শেভরন, ইউনোকল–সবাই লাউয়াছড়াকে গ্যাস বাণিজ্যের গিনিপিগ বানিয়েছে। কক্সবাজারের চকরিয়া সুন্দরবন, যা প্যারাবন নামে পরিচিত, বাণিজ্যিক চিংড়িঘেরের কারণে তা চোখের নিমেষে নিহত হয়েছে। সুন্দরবনও এই বহুজাতিক বাণিজ্যিক মারদাঙ্গার বাইরে থাকতে পারছে না। বহুজাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানি সুন্দরবনে শুরু করতে চেয়েছিল এলোপাতাড়ি খনন, প্রবল প্রতিরোধের চাপে তা বাতিল করতে বাধ্য হয় তারা।

দায়ী বন বিভাগ

অনেকে বলছেন, সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে নৌরুট না থাকলে এ ধরনের তেল বিপর্যয় ঘটত না। কিন্তু যে শ্যালা নদীতে এই ঘটনা ঘটেছে, তা উত্তরে পশুর ও দক্ষিণে বলেশ্বরের সাথে যুক্ত। সরেজমিনে সেই সব নদ-নদীতেও তেলের ধারা প্রবাহিত হতে দেখা গেছে। তথাকথিত কর্পোরেট সভ্যতায় হয়তো আমরা তেল পরিবহন বাতিল করতে পারব না। সুন্দরবনের নদী-খালের সাথে কোনো না কোনোভাবে যোগাযোগ আছে এমন কোথাও কোনো দূষণ ঘটলে এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব সুন্দরবনে পড়বেই। তাই সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো তেলদূষণ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া এবং তেলদূষণ রোধে প্রয়োজনীয় উপযোগী ব্যবস্থাপনা জোরদার করা। তবে এ ঘটনাকে সামনে টেনে তেলদূষণ নিয়ন্ত্রণের নামে কোনো কর্পোরেট বাণিজ্য সুন্দরবনের ওপর চেপে বসুক, তা কোনোভাবেই কাম্য নয়।

বাংলাদেশ পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২০০২ সালে প্রথম প্রমাণ করে, সুন্দরবনের উদ্ভিদবৈচিত্র্য কমবেশি তেলদূষণের ঝুঁকিতে আছে। তেলদূষণের সম্ভাব্যতা ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় ২০০১ সালে 'অয়েল স্পিল ইমপ্যাক্ট অ্যান্ড রেসপন্স ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম' নামে একটি প্রকল্প গ্রহণ করে। মংলা বন্দর কাছে থাকায় ঢাংমারী থেকে হিরন পয়েন্টকে তারা তেলদূষণের ক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে। পাশাপাশি সে সময় তেলদূষণের ফলে সুন্দরবনের কী কী ক্ষতি হতে পারে, এ নিয়ে একটি গবেষণা পরিচালনা করে বাংলাদেশ বন বিভাগ। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের (এডিবি) অর্থায়নে জাপান অয়েল ইঞ্জিনিয়ারিং কো. লি., ফুয়ো ওশান ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং কো. লি. এবং বাংলাদেশের কনসোলিডেটেড সার্ভিস লি. যৌথভাবে একটি পরীক্ষা চালায়। ২০০১ সালের আগস্টে এ নিয়ে করমজল বন্যপ্রাণী প্রজননকেন্দ্রে একটি পরীক্ষণস্থল তৈরি করা হয়। উল্লিখিত গবেষণায় ৬, ১০ ও ১৬ সপ্তাহ বয়সের গোল, সুন্দরী ও গেওয়াগাছের চারা ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবনের নদীর পানির সাথে বিভিন্ন মাত্রার জ্বালানি তেল, পেট্রোল ও ডিজেল মিশিয়ে সেসব চারাগাছে প্রয়োগ করা হয়। তারপর এদের সকলের টিকে থাকার বৈশিষ্ট্য ও অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা হয়। দেখা যায়, ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদের সকলেই তেলের প্রতি ভয়াবহ ধরনের সংবেদনশীল, কারণ তেলের আবরণ এদের শিকড়ে অক্সিজেন প্রবেশে বাধা দেয়। গেওয়ার চেয়েও এ ক্ষেত্রে সুন্দরী অনেক বেশি নাজুক। শামুক-ঝিনুক-কাঁকড়াসহ অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। মাছের ডিম পাড়া এবং বিচরণ বাধাপ্রাপ্ত হয়। পাখির মৃত্যু ঘটে বেশি। তবে হরিণ, বাঘ, ডলফিন, তিমি, গরু, ছাগল ও ভোঁদড়ের মৃত্যুর তেমন তথ্য নেই।

এই পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, প্রথম ১৫ দিনের মধ্যে পাখি, কচ্ছপ, ছোট মাছ ও অমেরুদণ্ডী প্রাণী মারা যাবে। ১৫ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে ছোট চারাগাছ মারা যাবে এবং বড় গাছের পাতা ঝরে পড়বে। এক বছরের মধ্যে কোনো ব্যবস্থা নেওয়া না হলে বড় গাছের ডালপালাও মরতে শুরু করে পরে গাছগুলোও মারা যাবে।

রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে একমাত্র বন বিভাগের কাছেই সুন্দরবনে তেলদূষণের ক্ষেত্রে কী ধরনের ক্ষতি হতে পারে এবং এ নিয়ে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি, এ বিষয়ে গবেষণা ছিল। কিন্তু ছয়টি জোয়ার-ভাটা চক্র শেষ হলেও বন বিভাগ কিছুই করেনি। সারা বনে তেলের ভয়াবহ বিস্তার ও আস্তরণ পড়েছে। ১২ ডিসেম্বর তারা ঘোষণা দিয়েছে তেল সংগ্রহের জন্য। গ্রামের শিশু-প্রবীণসহ নারী-পুরুষ সকলেই তেল অপসারণের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। নিজের গামছা-জামা-শাড়ি-গামলা-হাঁড়ি-পাতিল-বালতি, যার যা আছে তা নিয়েই। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সুন্দরবনে ছড়িয়ে পড়া তেল অপসারণে নেমেছে বনজীবী নিম্নবর্গ। কিন্তু রাষ্ট্র তাদের ন্যূনতম স্বাস্থ্যগত সুরক্ষা নিশ্চিত করেনি। করার প্রয়োজনও বোধ করেনি। একেবারে খালি হাত-পায়ে, খোলা শরীরে ঠাণ্ডা জলে নেমে মানুষ তেল সংগ্রহ করেছে। নাক-মুখে কোনো আবরণ না দিয়ে এসব তেলে আগুন জ্বালিয়েছে। মাত্র ৩০ টাকা করে এসব তেল কিনেছে পদ্মা তেল কোম্পানি।

তেল বিপর্যয়ের পর থেকে বন বিভাগের লাগাতার অপরাধ

১. ছয়টি জোয়ার-ভাটায় তেলের বহুমাত্রিক বিস্তার : ৯ ডিসেম্বর কার্গো বোট ডোবার পর বন বিভাগ ১২ ডিসেম্বর সকাল পর্যন্ত কিছু করেনি। এর মধ্যে ৬টি জোয়ার-ভাটার চক্র তেলের বহুমাত্রিক বিস্তার

ঘটিয়েছে সুন্দরবন জুড়ে।

২. স্বাস্থ্য ও প্রতিবেশগত সুরক্ষাবলয় তৈরি না করে তেল অপসারণ: ১২ ডিসেম্বর বন বিভাগ ঘোষণা দিয়ে স্থানীয় মানুষদের তেল অপসারণে কাজে লাগায়। এতে তারা উপকরণ বা পরামর্শ কোনো কিছুই দেয়নি। ন্যূনতম স্বাস্থ্যগত সুরক্ষার বিষয়গুলোও বিবেচনা করেনি।

৩. অপসারণের নামে বিপজ্জনক তেল মাটির নিচে চাপা দেওয়া : ১৩ ডিসেম্বর থেকে বন বিভাগ স্থানীয় বনজীবীদের মধ্য থেকে ৬৬ জন পুরুষ কর্মীকে নিয়োগ দেয়। বিনা পারিশ্রমিকে তাদের দিয়ে পায়ে চেপে বনের কাদামাটির তলায় কালো তেলের ঘন আস্তরকে তলিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। এতে সুন্দরবনের মাটির স্বাস্থ্য ও বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি ভেঙে পড়বে। মাটির মধ্যে বসবাসকারী পচন সৃষ্টিকারী অণুজীবের পচনপ্রক্রিয়া ব্যাহত হবে। উদ্ভিদের অঙ্কুরোদ্গম ও বেড়ে ওঠার পরিবেশ হারাবে তেলদূষিত এই মাটি। বন সম্পর্কিত রাষ্ট্রীয় আইনে বন বিভাগের এই মাটিদূষণ অন্যায়, অপরাধ।

৪. পানির ধারা দিয়ে তেল পরিষ্কার : ১৬ ডিসেম্বর বন বিভাগ হোসপাইপ দিয়ে সজোরে পানির ধারা ব্যবহার করে শ্বাসমূল, পাতা, কাণ্ড ও বনস্তর থেকে তেলের দাগ তুলে ফেলতে চেয়েছে। কিন্তু পারেনি, ব্যর্থ হয়েছে। এভাবে অন্যায় ঢাকা যায় না। এর ফলে পাতা ও কাণ্ডে লেগে থাকা তেলের কণা ছিটকে আরো বেশি বনের নানা স্তরে আটকে গেছে।

৫. গাছ ও ডাল-পাতা কেটে নেওয়া : ১৭ ডিসেম্বর বন বিভাগ খাল ও নদীর আশপাশে তেলের আস্তর লাগানো পাতা, কাণ্ড, চারাগাছ কেটে ফেলার নির্দেশ দেয়।

৬. সুন্দরবনকে অপমান : তেল বিপর্যয়ের ঘটনায় কোনো ধরনের প্রতিবেশ পদক্ষেপ না নিয়ে বন বিভাগ তেল বিপর্যয়ে সুন্দরবনের ক্ষতিকে '১০০ কোটি' টাকার হিসাবে হিসাব করেছে। কোনো ধরনের সম্পর্ক ও কারণ ছাড়াই এভাবে এক জটিল বাস্তুসংস্থানের দরদাম দুনিয়ার এক বৃহত্তম বনের প্রতি তীব্র অপমান।

ইউএসএআইডির অর্থায়নে কখনো আইপ্যাক, কখনো নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প–নানা নাম ও সাইনবোর্ডের বাহাদুরি সুন্দরবন থেকে টেনেহিঁচড়ে সরাতে চাইছে বনজীবীদের। এর অন্যতম উদ্দেশ্য সুন্দরবনের সম্পদকে একরতফা ছিনতাই ও লুট করা এবং ভৌগোলিক রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলে রাজনৈতিক মাতবরি প্রতিষ্ঠা করা। তেল বিপর্যয় ঘটনার মাত্র কয়েক মাস আগে বন বিভাগ আগামী পাঁচ বছরের জন্য সুন্দরবনকে সকল বনজীবীর জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

বনজীবী নিম্নবর্গ বনাম নয়া উদারবাদ

একতরফা নয়া উদারবাদী বাণিজ্য মনস্তত্ত্বের কারণেই মৃত্যুযন্ত্রণা পাড়ি দিয়ে চলেছে সুন্দরবন। কেবল সুন্দরবন নয়, দেশের সকল প্রাকৃতিক বনভূমিই একতরফা কর্পোরেট বাণিজ্যিক মনস্তত্ত্বের নিশানা। গ্যাস বাণিজ্যের কারণে লাউয়াছড়ার মতো বর্ষারণ্যকে কেটে টুকরো টুকরো করা হয়েছে। বহুজাতিক অক্সিডেন্টাল, শেভরন, ইউনোকল– সবাই লাউয়াছড়াকে গ্যাস বাণিজ্যের গিনিপিগ বানিয়েছে। কক্সবাজারের চকরিয়া সুন্দরবন, যা প্যারাবন নামে পরিচিত, বাণিজ্যিক চিংড়িঘেরের কারণে তা চোখের নিমেষে নিহত হয়েছে। সুন্দরবনও এই বহুজাতিক বাণিজ্যিক মারদাঙ্গার বাইরে থাকতে পারছে না। বহুজাতিক তেল-গ্যাস কোম্পানি সুন্দরবনে শুরু করতে চেয়েছিল এলোপাতাড়ি খনন, প্রবল প্রতিরোধের চাপে তা বাতিল করতে বাধ্য হয় তারা। এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বিশ্বব্যাংক, ইউএসএআইডি– কেউই বসে থাকেনি। সবাই এই বনের ওপর বহুজাতিক বাজারের নয়া উদারবাদী কর্তৃত্ব চাপিয়ে দিয়েছে। প্রবল জনপ্রতিরোধের মুখেও নির্দয় ও নির্লজ্জ রাষ্ট্র সুন্দরবনের কোলে রামপাল তাপবিদ্যুৎ প্রকল্প উদ্বোধন করেছে। বারবার নানা বাধা-নিষেধের পরও সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে নৌরুট চালু রয়েছে এবং বাণিজ্যিক পণ্য সরবরাহ হচ্ছে। সুন্দরবনের ভেতর দিয়ে লাগাতার ভারী জলযান চলাচলের একটাই উদ্দেশ্য– বহুজাতিক বাজারকে চাঙ্গা রাখা।

কোনোভাবেই নাজুক এই বনের প্রতিবেশরীতিকে আমলে নিচ্ছে না রাষ্ট্র। অথচ রাষ্ট্র নানা সময়ে কখনো শেল বা শেভরনের মতো বহুজাতিক কোম্পানি বা বিশ্বব্যাংক কি এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক বা মার্কিন দাতা সংস্থা ইউএসএআইডির চাপিয়ে দেওয়া প্রশ্নহীন অভিযোগ ছুড়ে দিয়েছে সুন্দরবনের প্রথাগত বনজীবীদের ওপর। নয়া উদারবাদের ফেরিওয়ালা এমন সব এজেন্সির মাধ্যমে রাষ্ট্র জোর করে প্রমাণ করতে চাইছে, সুন্দরবন ধ্বংসের জন্য বনজীবীরাই দায়ী। কিন্তু নয়া উদারবাদী এই চক্রান্ত ও অন্যায় বারবার ভুল প্রমাণিত হচ্ছে, ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে টিকে থাকছে বনজীবীদের বাদাবনবিজ্ঞান। ইউএসএআইডির অর্থায়নে কখনো আইপ্যাক, কখনো নিসর্গ সহায়তা প্রকল্প– নানা নাম ও সাইনবোর্ডের বাহাদুরি সুন্দরবন থেকে টেনেহিঁচড়ে সরাতে চাইছে বনজীবীদের। এর অন্যতম উদ্দেশ্য সুন্দরবনের সম্পদকে একরতফা ছিনতাই ও লুট করা এবং ভৌগোলিক রাজনীতিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই অঞ্চলে রাজনৈতিক মাতবরি প্রতিষ্ঠা করা। তেল বিপর্যয় ঘটনার মাত্র কয়েক মাস আগে বন বিভাগ আগামী পাঁচ বছরের জন্য সুন্দরবনকে সকল বনজীবীর জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মাছ, কাঁকড়া, গোলপাতা, মধু, মোম, গরান– কোনো কিছু আহরণের জন্যই বনজীবীদের কেউ আর সুন্দরবনে প্রবেশ করতে পারবে না। রাষ্ট্র কেবলমাত্র বহুজাতিক বাণিজ্যিক পর্যটনকে এখানে বৈধতা দিয়েছে। কিন্তু এভাবে কোনোভাবেই সুন্দরবনের জটিল বাস্তুসংস্থান বিকশিত হবে না। দুনিয়ার এই বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ অরণ্যকে টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কিছুই করেনি; যা করার তা সবই প্রথাগত বনজীবীদের ঐতিহাসিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সংগঠিত হয়ে চলেছে। কারণ বাঘ, বনজীবী, বনবিবি আর বাদাবন– সব মিলিয়েই সুন্দরবন। এ এক জটিল শৃঙ্খলা, হিসাব করে চলা বিজ্ঞান আর কঠিন নিয়মের গণিত।

রক্তাক্ত বাদানির্ভর জীবন

সুন্দরবনের ওপর এ অন্যায় আঘাত সরাসরি বননির্ভর জেলে, মৌয়াল, বাওয়ালি, চুনারিসহ সকল প্রথাগত বনজীবীর জীবন-জীবিকার ওপর প্রভাব তৈরি করবে। জীবিকা হারিয়ে উদ্বাস্তু হবে হয়তো এক বিশাল জনগোষ্ঠী। মধু, গোলপাতা, গরান, মাছ ও কাঁকড়ার উৎপাদন কমে গেলে তা স্থানীয় জীবিকা ও রাষ্ট্রীয় রাজস্ব আদায়কে সরাসরি ক্ষতিগ্রস্ত করবে। বৃহত্তম এই বনভূমি সিডর-আইলার মতো জলোচ্ছ্বাস থেকে দেশের ভূগোলের যে সুরক্ষা দেয় আর নিজ শরীরে কার্বন জমিয়ে দুনিয়ার জলবায়ু যেভাবে মজবুত রাখে, তার অর্থনৈতিক হিসাব কিভাবে করা সম্ভব? সুন্দরবনের এই

সাম্প্রতিক তেল বিপর্যয় দেশের জাতীয় অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করবে।

তেল বিপর্যয় যখন ঘটে তখন ছিল মরাকটাল, বাদাবন অভিধানে এর নাম 'ভাটিগা' বা মরা গোন। তারপর অমাবস্যায় শুরু হবে ভরাকটাল, স্থানীয়ভাবে যার নাম 'জুবা গোন'। সুন্দরবন সংসারের জেলেরা মাছ-কাঁকড়া ধরার আশা নিয়ে এই জুবা গোনের অপেক্ষা করেন। কিন্তু তেল বিপর্যয়ের পর তাঁরা এক অন্য গভীর শঙ্কা ও বেদনাবোধ নিয়ে এবার তাকিয়ে আছেন পরম বনের দিকে। কারণ জুবা গোনে জোয়ারের পানি বনতলকেও ভাসিয়ে দেবে, মানে তেলের বিস্তার বনের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। হয়তো মুমূর্ষু, মৃত বা গলিত মৃতদেহ সব ভেসে উঠবে। এই করুণ দৃশ্য তাঁরা সহ্য করতে পারবেন না। তেল অপসারণে তাই ঝাঁপিয়ে পড়েছে শিশু-নবীন-প্রবীণ সকলেই। নারী কি পুরুষ সবাই। পুরো পরিবার মিলে। চুলকানি, পেট ব্যথা, দাস্ত বমি– সব কিছু দমিয়ে তার পরও বনপ্রান্তের মানুষেরা আগলে রাখছেন বৃহত্তম এক অরণ্য।

ভয়াবহ তেল বিপর্যয়ের পরও সুন্দরবনের প্রবীণ বনজীবীদের বিশ্বাস, এই বন আবারও ঘুরে দাঁড়াবে, কারণ টিকে থাকার সংগ্রামে এই বন লড়াই করতে জানে। তা না হলে সিডর-আইলার মতো ঝড়-জলোচ্ছ্বাস সামলাবে কে? কে জোগাবে খাদ্য? নিজের বুকে কার্বন জমিয়ে কে দুনিয়ার ফুসফুস তাজা রাখবে? কিন্তু কোনোভাবেই টিকে থাকার ব্যাকরণ ও শক্তিগুলোকে আঘাত করা যাবে না। রাষ্ট্র এই বনের প্রতি বারবার তা-ই করে চলেছে।

টিকে থাকার সংগ্রাম

সুন্দরবনে সাম্প্রতিক এই তেল বিপর্যয়ের ঘটনাকে কোনোভাবেই হালকা হিসেবে নেওয়া জরুরি হবে না। এ ঘটনায় আন্ত মন্ত্রণালয় সমন্বয় জরুরি হয়ে পড়েছে। প্রথাগত বনজীবীসহ দেশের সকল প্রান্তের অভিজ্ঞজনদের নিয়ে সুন্দরবন সুরক্ষা কমিশন গঠন করা জরুরি। যত দ্রুত সম্ভব নিরাপদে তেল অপসারণ ও ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা জরুরি। রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে এই অবস্থান নিতে হবে– একতরফা বাণিজ্য না বৃহত্তম বাদাবন।

সাম্প্রতিক তেল বিপর্যয়ের ঘটনায় জাতিসংঘসহ নানা বিদেশি প্রতিষ্ঠান ও বিশেষজ্ঞ সাড়া দিয়েছে। তারা তেল অপসারণ ও দুর্যোগ রোধে সহায়তা দিতে চাইছে। দুনিয়ার বৃহত্তম এই ম্যানগ্রোভ অরণ্যের প্রতি এমন বৈশ্বিক সাড়া স্বাভাবিক। কিন্তু নজর রাখা জরুরি, তেল ব্যবস্থাপনার নামে আবার যেন সুন্দরবনে কোনো বহুজাতিক আগ্রাসন ও উন্নয়নের বাহাদুরি তৈরি করা না হয়।

ঐতিহাসিক শ্রী সতীশ চন্দ্র মিত্রের দুই খণ্ডে রচিত 'যশোহর খুলনার ইতিহাস' প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে। বইটির প্রথম খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লেখক বলেছেন, *'নাম যাহাই থাকুক সুন্দরবন চিরকাল আছে। হয়ত ইহা পূর্বে যেখানে ছিল এখন সেখানে নাই, কিন্তু ইহা চিরকাল আছে।'* সুন্দরবন আসলেই এক ঐতিহাসিক সত্য। বাঘ-কুমর-হরিণ-পতঙ্গ-পাখি-সরীসৃপ-ম্যানগ্রোভ বৃক্ষসহ প্রাণবৈচিত্র্যের সমাহার। বননির্ভর মৌয়াল, বাওয়ালি, জেলে, মাঝি, চুনারি, মুণ্ডা, মাহাতো, বাগদী সমাজসহ সকলের জটিল সম্পর্কের ভেতর দিয়েই সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভ আখ্যান। বিশ্বের বৃহত্তম একক ম্যানগ্রোভ বন, ইউনেস্কো ঘোষিত ৫২২ নং বিশ্বঐতিহ্য, ৫৬০তম রামসার অঞ্চল, দেশের এক গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশগত সংকটাপন্ন অঞ্চল, বিশ্বে ইরাবতী ডলফিনের সবচেয়ে বড় বিচরণস্থল কি বনবিবি-সংস্কৃতি, সব কিছুই গড়ে উঠেছে সুন্দরবনের বস্তুগত সত্যের ওপর। সুন্দরবন এক বস্তুবাদী বিকাশ, বিবর্তনবাদী বিজ্ঞান। ভয়াবহ তেল বিপর্যয়ের পরও সুন্দরবনের প্রবীণ বনজীবীদের বিশ্বাস, এই বন আবারও ঘুরে দাঁড়াবে, কারণ টিকে থাকার সংগ্রামে এই বন লড়াই করতে জানে। তা না হলে সিডর-আইলার মতো ঝড়-জলোচ্ছ্বাস সামলাবে কে? কে জোগাবে খাদ্য? নিজের বুকে কার্বন জমিয়ে কে দুনিয়ার ফুসফুস তাজা রাখবে? কিন্তু কোনোভাবেই টিকে থাকার ব্যাকরণ ও শক্তিগুলোকে আঘাত করা যাবে না। রাষ্ট্র এই বনের প্রতি বারবার তা-ই করে চলেছে। সুন্দরবনে বারবার ভারী নৌযান চলাচল করছে। সব কিছু নিয়ে একটার পর একটা নৌযান ডুবছে। ২০০২ সালে বাংলাদেশ বন বিভাগ সুন্দরবনে তেল বিপর্যয় হলে কী হবে এবং করণীয় বিষয়ে একটি গবেষণা প্রতিবেদনও তৈরি করেছে। তার পরও রাষ্ট্র নড়েনি। ভয়াবহ তেল দুর্ঘটনার পর জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সুন্দরবনের বনজীবী নিম্নবর্গই তেল অপসারণ করছে দিনরাত। রাষ্ট্রকে বনজীবী নিম্নবর্গ ও বাদাবনের এই জটিল সম্পর্ক ও বিজ্ঞানকে মানতে হবে। জোরজবরদস্তি করে জীবন চলে না, বিজ্ঞান তলিয়ে যায়। অণুজীব থেকে শুরু করে বাঘ-বৃক্ষলতা-পাখি-পতঙ্গ-মানুষ-বনবিবি–সব কিছু মিলিয়ে সুন্দরবন এমনই এক জটিল বিজ্ঞান।

সুন্দরবন লড়তে জানে, জোয়ার-ভাটার এই বিজ্ঞানে তারাই এ লড়াইয়ের সাথি হবে, সুন্দবনের ওপর সকল অন্যায় আঘাতকে যারা জান বাজি রেখে প্রশ্ন করে দাঁড়ায়। রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ কি এই কাতারে পড়ে?

পাভেল পার্থ : প্রাণ ও প্রতিবেশ-বিষয়ক গবেষক
ই-মেইল :animistbangla@gmail.com